Vol. 10 | No. 1 | 1966

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জায়সী ও আলাওল [নখশিখ খণ্ডের তুলনা]

Volume	10
Issue	1
Year	1966
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	June 15, 1966
DOI	10.62328/sp.v10i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v10i1.1
Pages	1-40
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
দশম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
বর্ষা : ১৩৭৩

Check for updates

জায়সী ও আলাওল

[নখশিখ খণ্ডের তুলনা]

সৈয়দ আলী আহ্সান

বর্তমান পরিচ্ছেদে 'নখশিখ' বা পদ্মাবতীর দেহ-সৌষ্ঠব-বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় কবির রচনারীতির তুলনা উপস্থিত করা হচ্ছে। প্রথমে মূল কাব্যের অনুবাদ, পরে তুলনামূলক আলোচনা এবং অবশেষে আলাওলের পাঠ উপস্থিত করা হল। মূল পদুমাবতের ৪১ সর্গে পুনরায় নখশিখের বর্ণনা এসেছে কিন্তু সে-বর্ণনা অসম্পূর্ণ—পদ্মাবতীর শিরোদেশ থেকে কটি পর্যন্ত। কিন্তু যতটুকু বর্ণনা আছে, তা বর্তমান অধ্যায়ের বর্ণনার সঙ্গে সমতাযুক্ত।

পণ্ডিত চন্দ্রাবলী পাণ্ডে 'নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা'য় (৪৩ বর্ষ, পৃঃ ২৫৫) লিখেছিলেন যে মন্ঝনের 'মধুমালতী'তে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় জায়সী তা অনুসরণ করেছিলেন। কথাটি দুটি কারণে সত্য নয়। প্রথমতঃ মন্ঝন জায়সীর পরবর্তী। এ-গ্রন্থের অন্য একটি অধ্যায়ে আমি তা প্রকাশ করেছি। দ্বিতীয়তঃ, জায়সীর বর্ণনা অনেক উচ্চকোটীর, মন্ঝনের ভাষা সে তুলনায় অনেক দুর্বল। দু-এক ক্ষেত্রে অবশ্য তুলনা চলে। টীকা অংশে আমি তা দেখিয়েছি।

মূলের অনুবাদ ঃ

১ ॥ হে রাজন, তার শৃঙ্গারের কি বর্ণনা করব। তার শৃঙ্গার তাকেই শোভা পায় অর্থাৎ তার অঙ্গের শোভা বর্ণনার অতীত। প্রথমে শিরোদেশে[১] কস্তুরি সুগন্ধিত কেশ, যার কাছে নরেশ তো অতি সাধারণ, বাসুকি পর্যন্ত বলি হয় বা নিবেদিত হয়। রাণী হল মালতী এবং কেশ হল ভ্রমর। মালতীর সুগন্ধে আঘ্রাণ নিচ্ছে বিষধর ভ্রমর। সে যখন বেণী খুলে চুলকে উন্মুক্ত করে দেয়, স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত অন্ধকার হয়ে যায়। তার কোমল এবং কুটিল কেশ পর্বতের উপরে সর্পের মতো যেন অনেক তরঙ্গ ছড়িয়ে অধিষ্ঠিত। যেন মলয়াচলের সুগন্ধ পেয়ে শিরোদেশে এসে তারা সুগন্ধ নিচ্ছে। বিষনিষিক্ত তার অলকগুচ্ছ গ্রীবাকে বেষ্টন করেছে।

শিরোদেশের কেশগুচ্ছ ফাঁদ বা বন্ধনের মতো যা গ্রীবাকে বন্ধন করে এবং তার কেশের বিন্যাসে অষ্টকুল নাগের[২] বসতি।

২ ॥ যে সীমন্তে এখনো সিন্দুর লাগেনি, শিরোভাগের সে সীমন্তের বর্ণনা করছি। সিন্দুরবিহীন সে সীমন্ত দীপকের মতো রাত্রিতে অন্ধকার পথকে যেন উজ্জ্বল করে। অথবা কষ্টিপাথরের স্বর্ণের রেখা, যা ঘন মেঘপুঞ্জে দামিনীসদৃশ। যেন গগনে বিশেষ সূর্য-কিরণ অথবা যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত সরস্বতীর উজ্জ্বল ধারা। অথবা রক্ত-লাঞ্ছিত খড়্গধার[৩], ত্রিবেণী-মোহনায় করপত্রের মতো। বেণীতে বিন্যস্ত মুক্তা যেন যমুনার মধ্যে গঙ্গার স্রোত। তপস্বীরা ত্রিবেণী-সঙ্গমে করপত্রের দ্বারা দেহ বিক্ষত করে যেন সে রক্তে তার সীমন্তে সিন্দুরের রেখা হয়। দ্বাদশ-ভাতি স্বর্ণ তার সীমন্তের সোহাগা বা সৌভাগ্য কামনা করছে। গগনাঙ্গনে শোভমান নক্ষত্রসকল সে-সীমন্তের সেবা করছে।

৩ ॥ ললাটের বর্ণনা করছি, সে ললাট দ্বিতীয়া চন্দ্রের জ্যোতির[৪] মতো। পরন্তু ললাটের ঔজ্জ্বল্য দ্বিতীয়ার চন্দ্রেও নেই। সহস্র কিরণ সে অংশুমালীর, ললাটের ঔজ্জ্বল্যের সম্মুখে সেও দ্যুতিহীন। তার উপমা চন্দ্রের সঙ্গেই বা কি করে দিই — চাঁদ যেখানে কলঙ্কযুক্ত, ললাট সেখানে কলঙ্কহীন।

চাঁদকে রাহু গ্রাস করে কিন্তু ললাট রাহু-স্পর্শবিহীন সদা প্রকাশ্য। তার ললাটের তিলক যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রাসনে আসীন ধ্রুব নক্ষত্র।[৫] অথবা কনক-পাটে বসেছেন রাজা, যেন শৃঙ্গারের সমস্ত সামগ্রীতে সুসজ্জিত হয়ে। এই তিলকরূপী প্রতাপী রাজার সম্মুখে কেউ স্থির থাকতে পারে না। জানিনা কার উপভোগের জন্য এহেন সংযোগ ঘটেছে। তার কাছে অর্থাৎ ললাটের কাছে নাসিকারূপী খড়্গ ভ্রূ-রূপী ধনুক একং নেত্রকটাক্ষ রূপী শর রয়েছে। তাই তার নাম জগৎ-হত্যাকারী। এ সংবাদ শুনে রত্নসেন একথা উচ্চারণ করে মূর্চ্ছিত হলেন: "এ সমস্ত অস্ত্রে আমার মর্মমূল বিদ্ধ হয়েছে।"

৪॥ তার শ্যাম ভ্রূযুগল শরনিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত ধনুকের জ্যা-এর মতো। যার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রতিই বিষবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। তার ভ্রূতে ধনুক সুসজ্জিত হয়েছে—কালরূপী এ-অস্ত্র কে নির্মাণ করেছে? এ ধনুক কৃষ্ণের কাছে ছিল, একই ধনুক রামের হাতেও ছিল। এ-ধনুক রাবণকে হত্যা করেছিল এবং কংসেরও নিধন ঘটেছিল একই অস্ত্রে। এ-ধনুক দিয়ে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেছিলেন। সহস্রবাহুর মৃত্যু ঘটেছিলো এ-ধনুকে।[৬] তার কাছে এ ধনুক আছে আমি জেনেছি। ধনুকধারিণী হয়ে সে সংসারকে আপন বেধ্য করেছে। কেউ এ ধনুককে জয় করতে পারেনি। এর সম্মুখে অপ্সরা এবং গোপিগণ লজ্জিত হয়ে আত্মগোপন করেছে। ভ্রূযুগল হল ধনুক, সে স্বয়ং ধনুকধারিণী, তার সমকক্ষ অন্য কেউ নেই। গগনে ইন্দ্রধনু উদিত হয়, কিন্তু ভ্রূ-ধনুক দেখে লজ্জিত হয়ে আত্মগোপন করে।

৫॥ দুটি বঙ্কিম নয়ন, যার তুল্য পূজ্য আর কিছু নেই। তারা সমুদ্রের মতো সদা কম্পমান। যেন রক্তকমলের উপর শিহরিত কৃষ্ণভ্রমর, মত্ত হয়ে ঘুরছে আবার উড়ে যাবার চেষ্টা করছে। বল্গাহীন তুরঙ্গের মতো যেন তা গগন স্পর্শ করছে। যখন পবন প্রবাহিত হয়, তখন সমুদ্র তরঙ্গ হিল্লোলিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করে, আবার ভূমিতে নামে। যখন নয়ন সমুদ্রের মতো দোলে তখন সে-সঙ্গে পৃথিবী দোলে। তার নেত্র-কটাক্ষে

এক পলকে সমস্ত সৃষ্টি চঞ্চল হয়। যখন উন্মীলিত নয়ন আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলে, তখন সমস্ত আকাশ যেন তার অতলে ডুবে যায়। তার উন্মীলিত নয়ন যেন যুগ্ম জলাবর্ত। যখন সে ইতি-উতি দৃষ্টিপাত করে, তখন সমুদ্র হিল্লোলিত হয় অথবা মনে হয় যেন যুযুদ্ধমান খঞ্জন অথবা ঘন বনে পথভ্রান্ত মৃগ। পরিপূর্ণ সমুদ্রের মতো তার নেত্রযুগল সেখানে তরঙ্গ আর মাণিক্য। কালরূপী ভ্রমরের সেখানে অধিষ্ঠান অর্থাৎ নয়নের পুত্তলি যা চোখের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সদা সঞ্চরমান। যে কেউ এর আকর্ষণে নিকটে এসেছে, সেই আহত হয়ে ফিরে গেছে।

৬॥ তার বরুণী বা নেত্রলোম বর্ণনার অতীত অপূর্ব। চক্ষুপল্লবের নেত্রলোম যেন বিশিখ-উদ্যত দুই বিপরীত সৈন্যদল। নেত্রলোম যেন নয়ন-সমুদ্রের উভয় তীরে সুসজ্জিত রাম ও রাবণের সেনাবাহিনী। উভয় তীরে প্রস্তুত রয়েছে শর-বিন্যাস; যার উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে সেই তীক্ষ্ণ বিষে জর্জরিত হয়। সমস্ত সংসার যেখানে শরাহত হয়ে আছে সেখানে এমন কে আছে যে শর-সংযোগহীন নিশ্চিন্ত? গগনে নক্ষত্র যা গণনার অতীত তারাও আহত হয়েছে শরাঘাতে। সমস্ত ধরণীই বাণবিদ্ধ। বৃক্ষের শাখা-গুলিও শাখা নয়, তারাও তার নেত্রলোমের তীক্ষ্ণশর। মানবদেহের রোম-কূপে অজস্র রোমাবলীও তীক্ষ্ণশরের স্বাক্ষর।

তার নেত্রলোমের অজস্র শর রণক্ষেত্রের যোদ্ধাকে এবং বনখণ্ডের বৃক্ষকে বিদ্ধ করেছে। পশুদের দেহের রোম এবং পাখীদের পালক সমস্ত কিছুই বরুণী-বাণ।

৭॥ তার নাসিকার তুলনা খড়্গের সঙ্গে কি করে দিই? খড়্গ ক্ষীণ কিন্তু নাসিকা ক্ষীণতর কেননা তা দেহ-সংযুক্ত। তার নাসিকা দেখে শুক লজ্জিত হল। তার নাকের বেসররূপে উদয় হল শুকতারা। আমি, স্বয়ং হীরামণি, তার নাসিকা দেখে লজ্জিত হয়ে হরিদ্রাভ হয়েছি। এখন, হে রাজন, অন্যের অবস্থার কথা কিই বা বর্ণনা করব! শুকের নাসিকা লৌহকারের পগরীর মতো কঠোর কিন্তু তার নাসিকা কোমল তিল-ফুলের মতো অথবা তার নাসিকা কোমল

এবং পুষ্প-সদৃশ তিলচিহ্নিত। পুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করে এ আশায় যে একদিন এ-সুগন্ধ তাকে পদ্মাবতীর নাসিকার কাছে নিয়ে আসবে। তার অধর এবং দন্তাবলীর উপর নাসিকার শোভা, যেন দাড়িম্ববিম্ব দেখে শুক লোভাতুর হয়েছে। উভয় পার্শ্বে খঞ্জন (অর্থাৎ নয়ন) খেলা করছে। জানিনা কেউ সে রস (অধরের রস) আস্বাদন করতে পারবে কি পারবে না। তার অধরের অমৃত-রস দেখে শুক নাসিকারূপ ধারণ করলো। হয়তো বা বাতাস অধরামৃতের স্বাদ বয়ে আনবে এ-আশায় শুক নাসিকার আশ্রয় ত্যাগ করলো না।

৮॥ তার আরক্ত অধর অমৃতরসপূর্ণ, বিম্বফল যার লালিমায় লজ্জিত হয়ে বনে আত্মগোপন করলো। যেন রক্তরংয়ের দুপহরী বা বান্ধুলী পুষ্প—সে যখন কথা বলে তখন ফুল ঝরে পড়ে। সে যখন হাসে তখন হীরকসদৃশ দন্তাবলী নিয়ে অধরের বিদ্রুম-মঞ্জুষা সমস্ত পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে। পানের রং লেগে তার অধর মঞ্জিষ্ঠার মতো রক্তিম হয়েছে যার সামনে কুসুমের রং মলিন মনে হয়। তার অধর অমৃতে পরিপূর্ণ, এখন পর্যন্ত সে-অধর স্পর্শহীন এবং কেউ যার স্বাদ গ্রহণ করেনি। তাম্বুলের রংয়ে রঙ্গিন সে অধর, কার অধর-সংযোগের জন্য সেখানে অমৃত সঞ্চিত রয়েছে? অধরকে রঙ্গিন দেখে পৃথিবী রক্তিম হয়েছে কিন্তু যখন সে হাসে তখন মনে হয় সব যেন রুধিরাশ্রিত। তার অধরের অমৃতকে সমস্ত পৃথিবী কামনা করে। এ-কমল (অর্থাৎ অধর) কার জন্য বিকশিত হয়েছে? কোন মধুকর এর রস পান করবে?

৯॥ তার সম্মুখের চারিটি দাঁত যেন হীরা—দাঁতগুলোর মধ্যে শ্যাম রেখা। যেন ভাদ্র মাসের অন্ধকার রাত্রিতে দামিনী। এ-ভাবে চমকিত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বত্রিশটি দাঁত। দন্তাবলীর জ্যোতি হীরকের জ্যোতির চেয়েও উজ্জ্বলতর। হীরকের জ্যোতি তো তার ছায়া মাত্র। যে দিন দশন-জ্যোতি নির্মিত হয়েছিল, সেদিন আরও অনেক জ্যোতির জন্ম হল। রবি, শশী এবং নক্ষত্র, রত্নমানিক এবং মোতি তার দশন জ্যোতিতেই প্রদীপ্ত। পদ্মাবতী যেখানে প্রসন্ন হয়ে হাসে, সেখানেই তার দন্তজ্যোতি

বিচ্ছুরিত হয়। চমকিত দামিনীও তার সমকক্ষ নয়। পৃথিবীতে অন্য কোন্ জ্যোতি দন্তজ্যোতির সমতা দাবী করতে পারে? সে যখন হাসে, হীরক চমকিত হয়ে ওঠে। সমকক্ষতা করতে পারেনা বলে দুঃখে দাড়িম্বের হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

১০ ॥ তার রসনার বর্ণনা করছি, সে রসনা রসপূর্ণ বাক্যের আধার, যার অমৃত বচন শুনে মন রক্তিম হয়। চাতক ও কোকিলের সুর তার কাছে পরাজিত, তেমনি অসমকক্ষ তার সঙ্গে বীণা এবং বংশীধ্বনি। তার কণ্ঠস্বর শুনে চাতক ও কোকিল লজ্জায় আত্মগোপন করে। প্রেম-মধুপূর্ণ পদ্মাবতীর কণ্ঠস্বর, সে বচন শুনে সকলেই মত্ত হয়ে ঘোরে। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ, এ চতুর্বেদের সমস্ত বক্তব্যই তার রসনাশ্রিত। অমরকোষ, ভাগবত, ছন্দোশাস্ত্র পিঙ্গল এবং গীতার অর্থ নির্ণয়ে কোনও পণ্ডিতই তার কাছে জয়ী হতে পারেনি। তার এক একটি বচনের চার চারটি অর্থ[৮] যা শুনে ইন্দ্র মোহিত হন এবং ব্রহ্মা মস্তকে করাঘাত করেন। পদ্মাবতী ভাস্বতী নামক জ্যোতিষগ্রন্থ, ব্যাকরণ, ছন্দোশাস্ত্র এবং পুরাণ পাঠ করেন এবং বেদের রহস্য উন্মোচন করেন। এসব শুনে সুজনের চিত্তে বাণবিদ্ধ হয়।

১১ ॥ তার সুরঙ্গ কপোলের কি বর্ণনা করব! তারা একটি নারাঙ্গির সম-বিভক্ত দুটি অংশ যেন। অপাঙ্গ-রূপী পুষ্পের পরাগ এবং মধু মথিত করে কে এই সুন্দর গোলক নির্মাণ করেছে? বামকপোলে একটি তিল-চিহ্ন। যে ব্যক্তি এ-তিল-চিহ্ন দেখে, সে তিলে তিলে দগ্ধ হয়। গুঞ্জাপুষ্প এ-তিলের কারণেই কৃষ্ণমুখী। এ-তিল যেন সম্মুখ-লক্ষ্যে নির্দেশিত বিরহ-বাণ। অথবা যেন অগ্নিবাণ, একটি কটাক্ষে যার দশ লক্ষ লোক নিহত হয়। কপোল থেকে এ তিল কখনও নিশ্চিহ্ন হয়না, তাই তার কপোল পৃথিবীর জন্য কালস্বরূপ। দুটিমাত্র নয়নে তিলের ছায়া পড়ে, সে-কারণে নয়ন হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ এবং রক্তিম। কপোলের এ-তিল দেখে গগনে একই স্থানে ধ্রুব নক্ষত্র অচল হয়ে রয়েছে। ক্ষণকালের জন্য উদিত হয়, আবার ক্ষণকালের জন্য ডুবে যায়, কিন্তু কপোলের তিলের সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে কখনও স্থান ত্যাগ করে না।

১২ ॥ শুক্তির মতো তার শ্রবণে[৯] দুটি স্বর্ণকুণ্ডল যেন দুটি দীপকের শোভা। অতিসুন্দর মণি-কুণ্ডল সেখানে চমকিত হচ্ছে, যেন কপোলের দুপ্রান্তে বিজলী প্রকাশিত হচ্ছে। উভয় প্রান্তে তারা দেদীপ্যমান যেন চন্দ্র এবং সূর্য। এত অগণিত তারকা (মণিমুক্তা) নিয়ে তারা উদিত হয়েছে যে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। সেখানে দীপকতুল্য খুঁট বা ঝুমকা শোভা পাচ্ছে। প্রতীত হচ্ছে যেন দুটি ধ্রুব নক্ষত্র দু প্রান্তে অধিষ্ঠিত। সিংহল দ্বীপের খুন্তী নামক এক অলঙ্কার সে তার কানে পরেছে। মনে হচ্ছে যেন অনেক তারকা নিয়ে কৃত্তিকা নক্ষত্র জাগ্রত হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে যখন সে মাথায় কাপড় টেনে দেয়, আকাশের দু প্রান্তে যেন বিদ্যুৎ চমকিত হয়। সিংহলের দেবলোক ভীত হন যদি হঠাৎ বিদ্যুতের রেখা তাদের উপর খসে পড়ে। পদ্মাবতীর শ্রবণ এত প্রদীপ্ত যে সকল নক্ষত্র তার সেবা করে। চন্দ্র এবং সূর্য যার সেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীতে আর কারও প্রয়োজন তার আছে কি ?

১৩ ॥ শঙ্খসদৃশ তার গ্রীবার বর্ণনা করছি। স্বর্ণতন্তু সজ্জিত কলসের কণ্ঠদেশ যেন। তার গ্রীবা যেন কাঠ কুঁদে করা হয়েছে। ময়ুর এ অপরূপ গ্রীবা দেখে পরাজিত ও বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন পারাবত চিত্তহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পারাবত চিত্তহারা হয়ে তার আপন কণ্ঠদেশ বিলম্বিত করছে। মনে হয় যেন একটি চক্রের উপর একটি ছাঁচ তৈরী করে গ্রীবাটি গঠন করা হয়েছে অথবা যেন লাগামবদ্ধ অশ্বের গ্রীবা। ময়ুর এবং তাম্রচূড় তার গ্রীবা দেখে পরাজিত হয়েছে, তাই সকাল সন্ধ্যা আর্তরোল তুলে তারা একথা জানায়। তার গ্রীবায় তিনটি রেখা দেখা যায় তিনটি ভাজের মতো। পানের যে রক্তিম রস সে পান করছে সে রেখার মধ্যে বাইরে থেকেই তা পরিস্ফুট। ধন্য এই গ্রীবা, বিধি যার মধ্যে এত শোভা দিয়েছেন। জানিনা কার সঙ্গে এই গ্রীবার বন্ধন ঘটবে। কণ্ঠশ্রী এবং মুক্তাবলী তার গ্রীবার অলঙ্কার। কোন প্রাণী এমন তপস্যা করেছে যে এই কণ্ঠের অলঙ্কার হয়ে কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে থাকবে ?[১০]

১৪ ॥ তার উভয় বাহু এবং মণিবন্ধ কনকদণ্ডতুল্য, যেন কাঠের গুড়িতে সুডোল করে নির্মিত হয়েছে। যেন দুটি তরুণ কদলীতরু।

তার হাতের তালু কমলের মতো রক্তিম। অনুমান হয় যেন হাতের তালুতে রক্ত রঞ্জিত হয়েছে। প্রভাতকালীন সূর্যের রক্তিম আভাও তার যোগ্য নয়, কেননা সেখানকার রক্তিম বর্ণ তাপযুক্ত, কিন্তু হাতের তালু শীতল। অথবা বক্ষদেশ থেকে হৃদয়কে নিষ্ক্রান্ত করে হাতের উপর রেখেছে যেন যার ফলে তার সমস্ত অঙ্গুলিতে রক্তিম আভা এসেছে। তার অঙ্গুলিতে রত্ন-জড়িত অঙ্গুষ্ঠ, সমস্ত সংসার প্রাণবিহীন, সমস্ত প্রাণ যেন পদ্মাবতীর হাতের মুঠোয়। বাহুতে সে কঙ্কণ পরেছে আর পরেছে টাড়[১১] নামক অলঙ্কার। যখন সে বাহু দোলায় অতি অপূর্ব গতিভঙ্গিতে, মনে হয় যেন কোন নর্তকী অঙ্গভঙ্গি করছে। তার বাহুর দোলায় মানুষের হৃদয় অপহৃত হয়। পদ্মের মৃণাল তার বাহুর সমকক্ষ নয়, এ কারণে সে অতি ক্ষীণ হয়েছে। এ কারণে মৃণালদণ্ডে কণ্টক দেখা যায়, কণ্টক যেখানে বিদ্ধ হয়েছে, সে স্থান দিয়ে মৃণাল যেন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে।

১৫ ॥ তার হৃদয়-বিভূষিত কুচ যেন কাঞ্চন গোলক, যেন অপূর্ব সুন্দর কনক কটোরা।[১২] তারা যেন অপূর্ব-নির্মাণ দুটি বিম্বফল, অথবা যেন অমৃতপূর্ণ দুটি রত্নাধার। তারা যেন কেতকী পুষ্প যার কণ্টকে ভ্রমর বিদ্ধ হয়েছে। স্তনের বৃন্তের উৎসে ভ্রমর যেন কঞ্চুকী বিদ্ধ করতে চায়, তারা যেন শাসনহীন যৌবনের বাণ, উল্লসিত হয়ে যেন হৃদয়ে সংলগ্ন হতে চায়। তারা যেন দুটি অগ্নিবাণ, যদি বক্ষদেশে সংযুক্ত না থাকত তাহলে সমস্ত পৃথিবীকে বিদ্ধ করত। তারা সেন উত্তুঙ্গ শাখায় সুরক্ষিত দুটি জম্বীর। এ রাজকন্যাকে কে স্পর্শ করতে পারে? এ দাড়িম্ব দ্রাক্ষাফল অনাস্বাদিত রয়েছে এবং দুটি নারাঙ্গী যেন কার আস্বাদনের জন্য রয়েছে। হে রাজন, অনেক ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষায় ভূমিতে মাথা রেখেছে এবং তপস্যা করেছে একে পাবার জন্য, কিন্তু কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনি। সকলেই স্পর্শহীন অবস্থায় শূন্য হাতে ফিরে গেছে।

১৬ ॥ ত্রিবলী রেখায় শোভমান তার ক্ষীণ উদর[১৩] যেন চন্দন বিচিত্রিত, যার বর্ণ কুঙ্কুম-কেশরের মতো। সুকুমারী পদ্মাবতী ক্ষীরাহার পর্যন্ত করতে পারে না, তার আহার্য বস্তু হচ্ছে পান এবং ফুল। তার

রোমাবলী কৃষ্ণ ভুজঙ্গিনীতুল্য।[১৪] নাভিদেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যা কমল বা মুখের দিকে যাত্রা করেছে। এ রোমাবলী দুটি নারাঙ্গীর মধ্যদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। সম্মুখে ময়ুর (অর্থাৎ গ্রীবা) দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর অগ্রসর হয়নি। অথবা এ রোমাবলী যেন ভ্রমরের পংক্তি যা চন্দনের স্তম্ভে অধিষ্ঠিত হয়ে মত্ত হয়েছে। অথবা বিরহব্যাকুল কালিন্দী নদী যেন অগ্রসর হতে হতে প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। তার নাভিকুণ্ডের মধ্যস্থলে যেন বারাণসী, কে তার সম্মুখে আসতে পারে? সেখানে মৃত্যুর বসতি।[১৫] তাকে পাবার আশায় অনেক ব্যক্তি শিরে করপত্র ধারণ করেছে। অথবা অগ্নিতে দেহকে তাপদগ্ধ করেছে। অনেকে অগ্নিধূমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে। কিন্তু সে কোন উত্তর দেয়নি, কেননা সে স্বয়ং নিরাশ বা কামনাহীন।

১৭॥ বৈরী পৃষ্ঠদেশ তার রোমাবলীকে পশ্চাতে এনেছে (অর্থাৎ বেণীরূপে তা পশ্চাদ্দেশে দোদুল্যমান) যেন কোনও সুসজ্জিত অপ্সরা পিছন ফিরে পথ চলছে। তার সে পৃষ্ঠদেশ মলয়গিরি-সদৃশ যার উপর বেণী-রূপিণী কৃষ্ণ নাগিনী অধিষ্ঠিত। তরঙ্গিত হয়ে সে যেন পৃষ্ঠদেশ বেয়ে উঠেছে এবং কাঁচুলীরূপী গাত্রাবরণের উপরও। চন্দনের মতো তার শরীরে বেণীরূপী সর্পিণী সুগন্ধ আস্বাদন নিচ্ছে, জানিনা এ বেণী কার জন্য নির্মিত হয়েছে। কৃষ্ণ আপন গৌরবে তার (সর্পের) শিরোদেশে আরোহণ করেছিলেন,[১৬] তখন নাগিনী পলায়ন করেছিল, কিন্তু এখন শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে আর পলায়ন করতে পারছে না। কৃষ্ণ নাগিনী তার মুখে কমল (পদ্মাবতীর মুখাবয়ব) ধারণ করে আছে যেন শশীর পশ্চাতে অধিষ্ঠিত রাহুবিশেষ। এ-নাগকে দেখবার অধিকার কার হবে? যার মস্তকে সৌভাগ্য অঙ্কিত আছে সেই দেখবার অধিকার পাবে। সর্প তার মুখে যে কমল ধারণ করে আছে, সে-কমলের উপর খঞ্জন পক্ষী বসেছে, এ-দৃশ্য যে দেখেছে সে পাবে সব কিছুই—ছত্র সিংহাসন, রাজ্য এবং ঐশ্বর্য।[১৭]

১৮॥ পৃথিবীতে পদ্মাবতীর কটিদেশের সমতুল্য আর কারও কটি নেই। সিংহের কটির সঙ্গে উপমা দিতে পারি, কিন্তু সিংহকটিও তার

সমতুল্য নয়। বোলতার কটি অত্যন্ত ক্ষীণ বলে বিখ্যাত; অধিকতর ক্ষীণ পদ্মাবতীর কটি। এভাবে পরিহাসে অথবা ঈর্ষার কারণে বোলতা পীতবর্ণ হয়েছে এবং প্রতিশোধের জন্য মানুষকে দংশন করছে। অথবা যেন কমল দণ্ড দুখণ্ড হয়েছে এবং উভয় খণ্ডের মধ্যে কটি-সদৃশ সূক্ষ্ম তন্তু এখনও বর্তমান। যখন তার বক্ষ দোলে তখন কটিরূপী সূক্ষ্ম তন্তু কম্পিত হয়। যখন সে পদচারণ করবে তখন কি করে বক্ষভার সে বহন করবে? ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত তার কটিবন্ধ দেখে রাজারা মুগ্ধ হন। মনে হয় ইন্দ্রসভার বাদ্য যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছে। মনে হয় বীণা বাজিয়ে কামিনীগণ রাগ-রাগিণী গাইছে। কটিদেশের সঙ্গে সমতা না করতে পেয়ে সিংহ বনবাস নিয়েছে, এবং সে কারণে ক্রোধবশতঃ মানুষ হত্যা করে তার মাংস খায় এবং রক্ত পান করে।

১৯॥ পদ্মাবতীর নাভিকুণ্ড মলয়াচলের সমীরসদৃশ সুগন্ধযুক্ত এবং সমুদ্রের গম্ভীর আবর্তের মতো। সমুদ্রের অনেক আবর্ত তার নাভিকুণ্ডের সঙ্গে সমতা না করতে পেরে ঘূর্ণিবায়ু হয়ে স্বর্গে উড়ে গেছে। চন্দনের মধ্যে কুরঙ্গিনীর পদচিহ্ন তার গুপ্ত দেহভাগ,[১৮] কে সেই রাজা 'ভোজ' যে তা অধিকার করবে? কে এর জন্য হিমাচলে তপস্যা করে তাপদগ্ধ হবে? কার ভাগ্যে পদ্মাবতী-লাভ লিখিত আছে? কে তার কামনায় আরক্তিম বা অনুরাগী হয়েছে? তীব্র কমল-সুগন্ধ সে দেহে (মদন মন্দিরে) এবং তার আবরণ-বস্ত্র পবনে হিল্লোলিত সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় শোভমান। বস্ত্রে রত্নখচিত রেশমগুচ্ছ দোদুল্যমান। জানিনা এ-ভাবে সুসজ্জিত করে কামদেব কার উপর কোপ বর্ষণ করছেন? তার গুপ্ত দেহভাগ এখন পর্যন্ত কমল-কলিকা, জানিনা কোন ভ্রমরের জন্য তা নির্ধারিত আছে। সমস্ত সংসার তার পরিমলমেদের সুগন্ধে বাসনা-বিদ্ধ। ভ্রমর এ-সুগন্ধের আঘ্রাণ নিয়ে লুব্ধ হয়ে নীবিবন্ধ ত্যাগ করতে চাচ্ছে না।

২০॥ তার কটিদেশের শোভা যে নিতম্ব[১৯] তার বর্ণনা করছি। সে নিতম্বের কারণে সে গজগামিনী, যা দেখে মন লুব্ধ হয়। অতি সুন্দর দুই জঙ্ঘা সেখানে সংযুক্ত হয়েছে যেন বিপরীতভাবে প্রোথিত দুই

কদলী স্তম্ভ। তার কমল চরণ অতি রক্তিম, সর্বদা তার সিংহাসনের উপর থাকে, কখনও মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। সকল দেবতা দুহাত দিয়ে তার পদদ্বয় ধারণ করে আছে।[২০] যেখানে পদ্মাবতী তার চরণ স্পর্শ করে সেখানে দেবতারা শির নোয়ায়। কে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে তার চরণ কমলদ্বয় আপন শিরোদেশে স্থাপিত করবে? পায়ের চূড়া চন্দ্র এবং সূর্যের মত উজ্জ্বল, মধ্যে মধ্যে পায়ল সমুদ্রের মতো ঝঙ্কার তুলছে। তার পদাঙ্গুলীর অলঙ্কার 'অনবট' এবং বিছা, যেন নক্ষত্র এবং তারা। তার সেই পায়ের কাছে কে অগ্রসর হতে পারে? পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করলাম পদনখ থেকে শিরোদেশ পর্যন্ত, কিন্তু তবুও যেন সমস্ত শৃঙ্গারের বর্ণনা করা গেল না। পৃথিবীতে এমন কোনও যোগ্য বস্তু আমার দৃষ্টিতে পড়ছেনা যার সঙ্গে তার উপমা চলতে পারে।

তুলনামূলক আলোচনা ঃ

পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় আলাওল যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। বস্তু-বিভাগে মূলের উপর নির্ভরশীলতা আছে, তথ্যনির্ণয়ও মূলানুগ, কিন্তু আবেগ ও প্রতিক্রিয়ায় আলাওলের একটি অন্তরঙ্গ রূপ এ অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়। যদিও সর্বত্র মূলের মত বর্ণনার বিস্তার নেই অথবা তথ্যগত সে প্রাচুর্য নেই যে প্রাচুর্যে পাণ্ডিত্য স্পষ্ট, তবুও একটি সজাগ আনন্দিত চিত্তের বিকাশ আলাওলের রচনায় ধরা পড়েছে।

প্রথম স্তবকের প্রথম চরণটি সম্পূর্ণরূপে মূলানুসরণ, কিন্তু পরবর্তী চরণগুলির বিন্যাস এবং সজ্জা আলাওলের নিজস্ব। "কা সিঙ্গার ঔহি বরনৌ রাজা" এবং "পদ্মাবতীর রূপ কি কহিমু মহারাজ" অবিকল একে অন্যের প্রতিরূপ। কিন্তু দ্বিতীয় চরণ "তুলনা দিবারে নাহি ত্রিজগত মাঝ" মূল "ঔহিক সিঙ্গার ঔহী পৈ ছাজা" শব্দগতভাবে সমান্তরাল নয়। মূলের বাচনভঙ্গিতে যেখানে রহস্যের ইঙ্গিত আছে, "তার শৃঙ্গার তাকেই শোভা পায়", বাংলাতে তা স্পষ্ট বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। মূলে 'কেশ'কে ভ্রমর এবং কৃষ্ণ সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আলাওল সেখানে কৃষ্ণ সর্পের সঙ্গে অলি, পিক, ভুজঙ্গ, চামর, জলধরকে এনেছেন। লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার

এই, মধ্যযুগে বাঙালী কবিরা উপমা-রচনার সময় সমতুল্য অনেকগুলো বস্তুর সন্ধান করতেন, একটি উপমাকে বিলম্বিত না করে তাঁরা সমধর্মী অনেকগুলো বস্তুর সমাহার ঘটাতেন যাতে কবির জ্ঞানের পরিচয়টা প্রবলভাবে ধরা পড়ত। জায়সী পদ্মাবতীর কেশকে সাপের সঙ্গে বস্তুগতভাবেই শুধু তুলনা করেন নি, তার গতির তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তার কুণ্ডলীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং উদ্যত ফণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মূলের দোহা অংশের অনুসরণ আলাওল করেন নি।

মূলের দ্বিতীয় স্তবকের কথাগুলি আলাওলের অনুবাদে গ্রাহ্য হয়েছে। সীমন্তকে 'খড়্গের ধার' অথবা 'স্থির সৌদামিনী'র অথবা 'কষটির মাঝে স্বর্ণরেখা' অথবা 'যমুনার মধ্যে সরস্বতী ধারা' মূলের 'খাঁউর ধারা', 'দাবিঁণি', 'কঞ্চন-রেখা কসৌটী কসী' এবং 'জবুঁনা মাঁঝ সরস্বতী' এ-কয়টি উপমার তথ্যনির্ভর যথাযথ রূপান্তর। আবেগ ও রস-নিবেদনের ক্ষেত্রে আলাওল একটি চরণে উন্নততর কাব্যশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'ত্রাসে ফাটিয়াছে যেন তিমিরের হিয়া'—উৎসাহিত আবেগের একটি উজ্জ্বল চরণ। মূলে এ-কথাটি নেই। বেণীর উপর করপত্র ধারণ ('করবত লেই বেণী পর ধরা') করবার কথা উল্লেখ করে জায়সী বলেছেন যে তপস্বীরা করপত্রের দ্বারা দেহ বিক্ষত করে এবং সে-ক্ষত-নিঃসৃত রক্তে তার সীমন্তের সিন্দুর হয়। আলাওলও বেণীর উপর করপত্র ধারণ করবার কথা বলেছেন কিন্তু কথাটি সেখানেই শেষ হয়েছে, অধিকতর বিবৃতির মধ্যে নতুন তত্ত্বসঞ্চয়ের সুযোগ দেন নি। তিনি সেখানে আলোসদৃশ মুখকান্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যা দেখে অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। ত্রিবেণীতে তপস্যারত অনেক যোগী করপত্র দ্বারা দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে। তাদের ধারণা আগামী জন্মে মনোবাঞ্ছিত ফললাভ করতে হলে আপন শরীরকে আহত করতে হয় যার ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে সেজন্য করপত্র অথবা খড়্গ রাখা আছে। দেহকে যন্ত্রণা দেবার এ-রীতি বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ততটা প্রচলিত নয়, যতটা বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে। এ-সাধনার খ্যাতি বাংলা দেশে ততটা নেই বলেই আলাওল এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। বস্তুর দৃশ্যমানতায় যে রসাবেগ জায়সীর কাব্যে তার ব্যাপক বর্ণনা আছে। আলাওল সে-ক্ষেত্রে চিত্তচাঞ্চল্যের কথা বলেছেন।

'অলকের ফাঁসে মন বন্দী' হ'য়েছে, এটা আলাওলের নিজস্ব প্রয়োগ। মূলে নেই।

তৃতীয় স্তবকটি অনেকদূর পর্যন্ত মূলের অনুসরণ। অনুবাদটি অনেকক্ষেত্রে শব্দগত এবং ধ্বনিগত অথচ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতির সঙ্গে একান্তভাবে সমান্তরাল। মূলে আছে :

কা সরি বরনক দিএউ ময়ংকু।
চাঁদ কলংকী বহ নিকলংকু॥

আলাওল অনুবাদ করেছেন :

কেমতে বোলিমু ভাল তুলনা ময়ঙ্ক।
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক॥

আলাওল ললাটকে ব'লেছেন 'ভাগ্যের উদয়স্থলী', মূলে এহেন তত্ত্ব আরোপ নেই, যদিও ললাটকে ভাগ্যের স্বাক্ষর হিসেবে গণনা করা সর্বত্র প্রচলিত। 'জন্মখণ্ডে' জায়সী ললাটে ভাগ্যলিপি অঙ্কনের কথা বলেছেন। মূলে ললাটের সঙ্গে সূর্যের তুলনাও আছে কিন্তু আলাওল শুধু চাঁদের উপমাকেই বর্তমান রেখেছেন। মূলে ললাটের তিলক-চিহ্নকে ধ্রুব নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। অনুবাদে তুলনাটি নেই। এ-স্তবকের শেষ চারিটি চরণ সম্পূর্ণরূপে আলাওলের নিজস্ব। মূলের দোহা অংশে ক্ষণকালের জন্য বর্ণনা-বিরতিতে একটি নাটকীয় আবেগ আছে যেখানে রাজা রত্নসেন এ-কথা উচ্চারণ করে মূর্চ্ছিত হচ্ছেন যে পদ্মাবতীর দেহ-সংসক্ত সমস্ত সৌন্দর্য-অস্ত্রে তাঁর মর্মমূল বিদ্ধ হয়েছে।

মূলের চতুর্থ স্তবকের প্রথম চরণদ্বয়ের অনুবাদ বাংলাতে খুবই সঙ্গত। জায়সী যেখানে বলছেন :

ভউহই সাঁব ধনুখ জনু তানা।
জা সউ হের মারু বিখ বানা॥

আলাওল সেখানে বলছেন,

কামের কোদণ্ডভুরু অলক্ষ্য সন্ধান।
যাহারে হেরএ তার হানএ পরাণ॥

কিন্তু আলাওলের পরবর্তী চরণগুলি বাঙালী কবির নিজস্ব প্রক্ষেপ। মূলে অনেকগুলি পৌরাণিক ঘটনা-নির্দেশ আছে, যেমন কৃষ্ণের, রামের এবং অর্জুনের শর-নিক্ষেপের কাহিনী। বাংলাতে এ-ঘটনাগুলি অনুসৃত হয়নি। আলাওলের দ্বিতীয় চরণদ্বৈতে একটি উজ্জ্বল আবেগের পরিচয় আছে:

ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুমশর ধনু॥

এ-চরণ দুটিতে দৃশ্যমান কোনও রূপাভিব্যক্তি নেই কিন্তু আবেগের একটি রহস্য সৃজিত হয়েছে যা হৃদয়ের তাপে লালিত এবং আনন্দে অধিগম্য।

মূলের দোহাভাগ অনুবাদে সর্বশেষ বক্তব্যরূপে প্রকাশ না পেয়ে অন্তর্বর্তী তথ্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। মূলে আছে:

গগন ধনুখ জো উগ্‌গবই লাজই সো ছপি জাই।

আলাওল লিখেছেন:

কদাঞ্চিৎ গগনে উগিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরুভঙ্গ দরশনে লুকাএ নিজ তনু॥

অনুবাদটি এখানে ব্যাখ্যাসহ এবং বিবৃতি-মূলক।

আলাওলের কবিতায় ভুজঙ্গের তথ্যটি নতুন সংযোজন, মূলে নেই।

মূলের পঞ্চম স্তবক থেকে আলাওল তথ্য-সংকেত নিয়েছেন মাত্র। বর্ণনা-পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব এবং উপমার বিন্যাসেও মূলানুসরণ নেই। কিন্তু পরিবর্তিত রূপে আলাওল মূলের তুলনায় অনেক বেশী নিষ্প্রভ। জায়সী পদ্মাবতীর চক্ষুকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ-উপমাটিই প্রধান উপমারূপে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য উপমাগুলি প্রধান উপমাটির অনুষঙ্গে এসেছে। যেমন, রক্তকমল সমুদ্রে প্রস্ফুটিত, অশ্ব বা উচ্চৈঃশ্রবা মান-সরোবর মন্থনে উত্থিত হয়েছিল, উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ এবং ঘূর্ণাবর্ত সমুদ্রের ইঙ্গিত বহন করে, মণিমুক্তা সমুদ্রের অতলে লুক্কায়িত থাকে। এভাবে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে জায়সী পদ্মাবতীর চক্ষুর তুলনা করেছেন। কিন্তু আলাওলের উপমাগুলি

বিক্ষিপ্ত—কোনও একটি একাগ্র লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়নি। সমুদ্রের সঙ্গে সেখানে (সমুদ্রও এসেছে অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে, আভাষে) সূর্য এসেছে, নির্মল দর্পণ এসেছে এবং দিবা ও রাত্রি এসেছে। মনে হয়, আলাওল মূলের আশ্চর্য কৌশলটি বুঝতে পারেন নি। সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে চক্ষুর বর্ণনাকে জায়সী যেখানে প্রগাঢ় করেছেন, আলাওল সেখানে কয়েকটি লঘু এবং প্রগল্‌ভ উপমায় বর্ণনাকে কেন্দ্রচ্যুত করেছেন। পদ্মাবতীর চক্ষু দেখে বিভিন্ন পুরুষের চিত্তে কি প্রতিক্রিয়া জাগছে, আলাওল সে-কথাই কয়েকবার বলেছেন। সাধু সন্ন্যাসীদের চিত্ত বিভ্রান্ত হচ্ছে, ত্রিজগতের প্রাণী সে নেত্র-কটাক্ষে নিহত হচ্ছে অথবা কোনও পুরুষ চিত্তবিকল হবার ভয়ে তার চোখের উপর চোখ রাখতে পাচ্ছে না—এ-উক্তিগুলিতে কোনও বিশিষ্টতা নেই, এগুলি মধ্যযুগের প্রথাগত বর্ণনা মাত্র।

মূলের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ চরণে আছে:

সমুঁদ হিলোর করহিঁ জনু ঝুলে।
খঞ্জন লরহিঁ মিরিগ বন ভূলে॥

অর্থাৎ যখন তার নয়ন গতি পায় অথবা কম্পিত বা চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে, তখন যেন সমুদ্র হিল্লোলিত হয়। যেন খঞ্জন-যুগল বিবদমান অথবা যেন পথভ্রান্ত মৃগ। এখানকার উপমা কয়টি সংস্কৃত শাস্ত্রসিদ্ধ মালোপমা।

আলাওল তৃতীয়-চতুর্দশ চরণে বলছেন:

কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র আঞ্জন রঞ্জিত॥

এখানে তুলনা কয়টি নয়নের সাধারণ রূপের সঙ্গে, চঞ্চলতার সঙ্গে নয়। কবি বলতে চাচ্ছেন যে পদ্মাবতীর চক্ষু দেখে বনে হরিণ আত্মগোপন করল, মাছ লুকাল গভীর জলে। তার সে অঞ্জনরঞ্জিত নেত্র খঞ্জন পাখীকেও গঞ্জনা দেয়। আলাওলের বর্ণনাটি প্রথানির্ভর এবং দুর্বল।

পঞ্চম স্তবকে কেন্দ্রীয় উপমা সমুদ্রের, ষষ্ঠ স্তবকে কেন্দ্রীয় উপমা অন্যান্য তীক্ষ্ণশরের। সমস্ত উপমাগুলি শরাঘাতে আহত বা বিধ্বস্ত বিভিন্ন

উপাদানের। কখনও গগন, কখনও ধরণী, কখনও বৃক্ষের শাখা এবং কখনও রোমাবলী। জায়সী যুক্তি-তৎপরতায় তীক্ষ্ণশরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বিভিন্ন উপমাকে বিন্যস্ত করেছেন। অধিকন্তু পূর্ববর্তী স্তবকের সঙ্গেও বর্তমান স্তবকের তাৎপর্য--পরম্পরা রয়েছে। সেখানে নেত্রকে বলা হয়েছে সমুদ্র, এখানে নেত্রের উভয় পার্শ্বের পল্লবকে বলা হয়েছে সমুদ্রের উভয়তীরে শর-সজ্জিত রাম-রাবণের সৈন্য।

আলাওলের কবিতায় তীক্ষ্ণশরের যুক্তি-পরম্পরা রক্ষিত হয়নি। তিনি প্রধানতঃ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ-কল্পনার উপর যে সমস্ত পুরুষ যাচ্ঞা করেছে যেন তারা শরাহত হয়। কল্পনাটি বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতায় লালিত। আলাওলের প্রথম ছয়টি চরণে মূলের অনুসৃতি আছে, কিন্তু পরবর্তী ছয়টি চরণ মূলের সঙ্গে সমান্তরাল নয়।

সপ্তম স্তবকে মূলের উপর আলাওলের নির্ভরতা অধিকতর স্পষ্ট। মূল থেকে সর্বপ্রকার তথ্যের সঙ্কেত তিনি নিয়েছেন, কিন্তু মূলের আরোপ্য অর্থ অনুবাদে পরিবর্তিত হয়েছে। মূলে গরুড় পক্ষীর উল্লেখ নেই, কিন্তু আলাওল খগপতির উপমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে খগচঞ্চুর সঙ্গে নাসিকার তুলনা একটি প্রচলিত বিধি। আলাওলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আলাওল বলেছেন যে, পদ্মাবতীর নাসিকা খগপতির চঞ্চুর মত, এবং অধরের উর্ধ্বে নাসিকার স্থিতিকে তিনি বলেছেন যে, অধরের অমৃতরসের আস্বাদনের জন্য খগপতি এসেছে যেন। মূলে আছে, পদ্মাবতীর অধর এবং দন্তাবলীর উপর নাসিকার শোভা দেখে মনে হয় যেন দাড়িম্ব বিম্ব দেখে শুক লোভাতুর হয়েছে। মূলের পাঠটি এই :

অধর দসন পই নাসিক সোভা।
দাড়িউঁ দেখি সুআ মন লোভা॥

আলাওল বলেছেন :

দশন ডালিম্ব বীজ অধর বিম্বফল।
অতি লোভে মজি শুক রহিল নিশ্চল॥

অনুবাদটি মূলের অনুগত, কিন্তু এর পরবর্তী কথাগুলি মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখেনি। আলাওল এখানে খগপতির উপমা এনেছেন, তিনি বলেছেন :

সুরঙ্গ অধর সুধা রসের বসতি।
অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি॥

মূলে আছে :

দেখি অঁমী-রস অধরন্থ ভয়েউ নাসিকা কীর।

অর্থাৎ তার অধরের অমৃত রস দেখে শুক নাসিকার রূপ ধারণ করল। এখানে অনুবাদে অর্থের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। অন্য একটি ক্ষেত্রেও অর্থের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জায়সী বলছেন :

পুহুপ সুগন্ধ করহিঁ সব আসা।
মকু হিরিকাই লেই হম বাসা॥

অর্থাৎ পুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করে এ আশায় যে একদিন পদ্মাবতী নাসিকার কাছে নিয়ে যেয়ে তার এ সুগন্ধ আঘ্রাণ করবে। আলাওল বলছেন :

সে নাসা পরশ হেতু যত পুষ্পগণ।
সৌরভ হইতে কৈল বিধি আরাধান॥

এখানে অর্থটা হল যে নাসিকার স্পর্শ পাবার আশায় সকল পুষ্প সুরভিত হবার জন্য আকাঙ্খিত হল।

পরিবর্তিত অর্থটি মূলের চেয়ে অধিকতর প্রগাঢ়।

অষ্টম স্তবকে আলাওলের প্রথম দুটি চরণ মূলের প্রথম চরণ-দ্বৈতের অবিকল অনুবাদ। জায়সী বলছেন :

অধর সুরঙ্গ অঁমী-রস ভরে।
বিম্ব সুরঙ্গ লাজি বন ফরে॥

অর্থাৎ আরক্তিম অধর অমৃতরসপূর্ণ, রক্তিম বিম্বফল সে অধর দেখে বনে আত্মগোপন করল। আলাওল লিখছেন :

সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিম্ব বান্ধুলি গমন বনান্তর॥

বাংলা কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ আলাওলের নিজস্ব। মূলের অন্যান্য চরণগুলিও পূর্ণরূপে অনুসৃত হয়নি। আলাওলের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ চরণ মূলের চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল। বিশেষ করে: 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে'। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এই চরণটি অসাধারণ এবং দ্বিতীয়-রহিত। মূলে আছে: 'ভই মজঁীঠ পনহু রঁগ লাগে' অর্থাৎ পানের রং লেগে তার অধর মঞ্জীষ্ঠার মত লাল হয়েছে। জায়সীর কথাটি একটি সাধারণ সত্য, কিন্তু আলাওলের কথাটিতে হৃদয়ের উত্তাপ আছে এবং প্রেম-কল্পনার আশ্রয় আছে। আমার পরীক্ষিত আলাওলের সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই এ-পাঠটি পাওয়া যায়। একটি মাত্র পাণ্ডুলিপিতে [বাংলা একাডেমীর ক্রমিক সংখ্যা ৩/আ৩/প৩] অন্য পাঠ পাওয়া যায় —'রাতুল অধর হইল তাম্বুলের রসে'। এ পাঠটি যদিও হিন্দীর সঙ্গে অধিকতর সঙ্গত, কিন্তু দুটি কারণে গ্রহণ করা সম্ভবপর হল না। প্রথম কারণ, পুথিটি আধুনিক হস্তলিপির এবং লিখন রীতি ও বর্ণাশুদ্ধি দেখে মনে হয় লিপিকর অর্ধ শিক্ষিত। দ্বিতীয় কারণ, আলাওল সৌন্দর্যবর্ণনার ক্ষেত্রে বস্তুনির্ভরতা ত্যাগ করে কখনও কখনও মূলের অর্থের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন এবং সেখানে অনুভূতিগত নূতন অর্থ আরোপ করেছেন।

নবম স্তবকটি মূলের সম্পূর্ণ অনুগত, আলাওল কিছুটা ভাব-সংক্ষেপে করেছেন মাত্র। সংক্ষেপিত রূপে বক্তব্য অস্পষ্ট হয়নি বরঞ্চ প্রগাঢ়তা পেয়েছে। মূলে যেখানে আছে:

"জেহি দিন দসণ জোতি নিরমঈ।
বহুতই জোতি জোতি বহ ভঈ॥
রবি সসি নখত দিপহিঁ তেহি জোতী।
রতণ পদারথ মানিক মোতী॥

এর অর্থ, যেদিন দশন-জ্যোতি নির্মিত হল, সেদিন জন্ম হল আরও অনেক জ্যোতির—রবি, শশী, নক্ষত্র, রত্নমানিক এবং মোতি, এরা সকলেই সে দশন-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত। আলাওল একে সংক্ষিপ্ত করে লিখেছেন:

যখন সৃজিল বিধি জগতের জ্যোতি।
কিঞ্চিত ঝলক পাইল হীরা রত্ন মোতি॥

আলাওলের শেষ চরণটি মূলের সম্পূর্ণ অনুগত। জায়সী লিখছেন :

দারিউ সড়ি জো ন কই সকা ফাটেউ হিআ তরক্কি।

সমকক্ষতা করতে পারে না বলে অতি দুঃখে দাড়িম্বের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আলাওল লিখছেন :

অতি দুঃখে দাড়িম্ব বিদরে নিজ হিয়া।

দশম স্তবকটিও মূলের অত্যন্ত অনুগত। এখানে উভয় কাব্যের পাঠ চরণে চরণে অনেকটা মিলিয়ে পড়া যায়। মূলের সমস্ত তথ্যই আলাওল গ্রহণ করেছেন। মূলে আছে যে, পদ্মাবতীর রসনাশ্রিত হয়েছে যে সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান, তা হল চতুর্বেদ, অমরকোষ, ভাগবত, ছন্দোশাস্ত্র পিঙ্গল, গীতা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, পুরাণ এবং ব্যাকরণ। আলাওলও বলছেন যে, পদ্মাবতীর রসনায় বর্ণিত হয় ব্যাকরণ, বেদ, পুরাণ, অমরকোষ, ছন্দোশাস্ত্র পিঙ্গল, গীতা এবং নাটিকা।

মূলে আছে, পদ্মাবতীর রসনায় বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে ব্রহ্ম পরাভূত হয়ে শিরে করাঘাত করেন, আলাওল সেখানে বলছেন : "সুরগুরু সমশাস্ত্রে সুচারু সুষম।"

মূলে আছে, বিভিন্ন শাস্ত্রের অর্থনির্ণয়ে কোন পণ্ডিতই তার কাছে জয়ী হতে পারেনি। আলাওল সেকথা বলছেন এভাবে :

অর্থ বুঝি গুণিগণ পরাভব পায়।

একাদশ স্তবকে আলাওল মূলের ভাব সংক্ষেপ করেছেন। মূলের চৌপাঈয়ের চৌদ্দটি চরণ এবং দোহা অংশের দুটি চরণ অনুবাদে মোট আটটি চরণে পরিণত হয়েছে। সুতরাং বক্তব্য যে গুরুতর রকমে সংক্ষিপ্ত হয়েছে তা সহজেই বলা যায়। এখানে আমার মনে একটা সংশয় উপস্থিত হয়েছে, সম্ভবতঃ আলাওলের পাঠটি এতটা সংক্ষিপ্ত ছিল না। কেননা, প্রথম তিনটি চরণ-দ্বৈতের পর বিক্ষিপ্তভাবে নয়নের অঞ্জনের যে কথাটি এসেছে, তা কিছুটা অসঙ্গত।

দ্বাদশ স্তবকেও মূলের অনুসরণ যথাযথ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রীতি-অনুসারে আলাওল একটি দুটি উপমা এনেছেন যা মূল কাব্যে নেই। গৃধিনী পাখীর কানের সঙ্গে নায়িকার কানের তুলনা মধ্যযুগের প্রথাগত। জায়সীর কাব্যে এ উপমাটি নেই।

জায়সী যেখানে বলছেন যে, তার শ্রবণযুগল শুক্তির মতো, আলাওল সেখানে বলছেন যে তার শ্রবণযুগল "সিন্ধু সুতার" মত।

বিহার এবং উড়িয়্যা অঞ্চলে রমণীদের বিভিন্ন কর্ণাভরণ 'খুঁট', 'খুন্তি' এবং মকর কুণ্ডল বাংলা কবিতায়ও ব্যবহৃত হয়েছে।

মূলে যেখানে আছে :

খন খন জোহি চীর সির গহা।
কাঁপত বীজু দুহুঁ দিসি রহা॥

অর্থাৎ, ক্ষণে ক্ষণে যখন সে চীরবস্ত্র মাথায় টেনে দেয়, আকাশের দুপ্রান্তে যেন বিজলি চমকিত হয়। আলাওল এখানে লিখছেন :

যখনে চিকন বস্ত্রে করএ ঘোঁঘট।
কর্ণান্তরে অর্কতারা কিঞ্চিৎ প্রকট॥
কনক কষটি পত্র কাম্পে থর থর।
চমকে বিজুলি যেন শ্বেত ঘনান্তর॥

মূলের উপর নির্ভরশীল হয়েও আলাওলের রচনার অননুকরণীয় একটি নিজস্ব স্বাদ আছে, যাকে ঠিক অনুবাদ বলা চলে না।

বাংলা কাব্যে ত্রয়োদশ স্তবকটি একটি সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন। বর্ণনাটি সম্পূর্ণ মুখ কান্তির। মুখাবয়বে অধিষ্ঠিত সমস্ত অংশের বর্ণনা শেষ হবার পর কবি একটি স্বচ্ছ পরিপূর্ণতায় অবয়বটির রূপ নিরীক্ষণ করেছেন। অবশ্য এ বর্ণনার মধ্যে পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলির অনুরণন আছে। পূর্বে যে সমস্ত অঙ্গের কথা বলা হয়েছে, যেমন, ললাট, নাসিকা, কপোল, শ্রবণ, অধর, সে সমস্ত বর্ণনার আভাস এ স্তবকে আছে, শুধুমাত্র চিবুকের কথাটি সম্পূর্ণ নূতন। সম্পূর্ণ মুখাবয়বের মধ্যে রমনীর সৌন্দর্যের উজ্জ্বল

বিকাশ থাকে এবং প্রেম অথবা হৃদয়ের তাপ এই মুখকান্তিতেই শোভমান, তাই একান্ত করে সম্পূর্ণ মুখ কান্তির একটি বর্ণনা সমীচীন হয়েছে।

বাংলার চতুর্দশ স্তবক মূলের ত্রয়োদশ স্তবকের অনুসরণ, এই স্তবকে গ্রীবার বর্ণনা করা হয়েছে। অনুবাদের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মূলে আছে :

পুনি তেহি ঠাউঁ পরী তিরি রেখা।
ধুঁট জো পীক লীক সব দেখা॥

অর্থাৎ, তার গ্রীবায় তিনটি রেখা দেখা যায়। পানের যে রক্তিম রস সে পান করে সে রেখার মধ্যে বাইরে থেকেই তা পরিস্ফূট।

আলাওল লিখছেন :

কাঁচের গঠন জিনি গিম মনোরথ।
ঘুঁটিতে তাম্বুল রস দেখএ বেকত॥
তেঁই ঠাঞি তিন রেখা দেখিতে কৌতুক।
লাজ হেতু কম্পুবর জলে দিল লুক॥

আলাওলের অনুবাদে মূলের অর্থের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। আলাওল বলছেন যে কাঁচের মতো স্বচ্ছ বলে সে যা কিছু পান করে বাইরে থেকে তা দেখা যায়। কণ্ঠদেশে তিনটী রেখা বাংলা কবিতায় ভিন্ন একটি সৌন্দর্য-সংবাদ হিসাবে এসেছে। আলাওল জায়সীর মতো একথা বলছেন না যে, কণ্ঠরেখার ভাজে তাম্বুলের রস বাইরে থেকে দেখা যায়।

মূলের দোহা অংশের একটি সজীব বর্ণনা আলাওলের অনুবাদে একটি নিরীহ বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। জায়সী বলছেন যে, কণ্ঠশ্রী এবং মুক্তাবলী তার গ্রীবার অলঙ্কার। কোন প্রাণী এমন তপস্যা করেছে যে এসব অলঙ্কার হয়ে কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে থাকবে? আলাওল বলছেন, :

পূর্ব জন্মে কোন তপ সাধিছে অসীম।
কার ভূজে সমর্পণ হৈব হেন গিম॥

আলাওলের পঞ্চদশ স্তবক মূলের চতুর্দশ স্তবকের অনুসরণ। জায়সীকে অনুসরণ করে আলাওল পদ্মাবতীর বাহু এবং করতলের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলাওলের কাব্যে একটি নূতন সংযোজন আছে, তা হল করাঙ্গুলির বর্ণনা। বাহুর বর্ণনা মূলের অনুগত হয়েও বিশিষ্ট। জায়সী বলছেন :

হিআ কাঢ়ি জনু লীন্হেসি হাথা।
রুহীর ভরী অঁগুরী তেহি সাথা॥

অর্থাৎ, বক্ষদেশ থেকে হৃদয়কে নিষ্ক্রান্ত করে হাতের উপর রেখেছে এবং তার ফলে তার অঙ্গুলিতে রক্তিম আভা এসেছে। আলাওল সেখানে লিখেছেন :

চতুরের মর্মান্তরে করযুগ খেপি।
বাহির করিছে কিবা করে রক্ত লেপি॥

চতুর বা প্রেমিকের উল্লেখ বক্তব্যটিতে একটি রসাবেশ এনেছে।

মূলে যেখানে যে কোন নর্তকীর গতিভঙ্গির সঙ্গে পদ্মাবতীর গতিভঙ্গির তুলনা করা হয়েছে, আলাওল সেখানে দুজন নর্তকীর নাম উল্লেখ করেছেন—রম্ভা ও তিলোত্তমা। মূলে যেখানে কঙ্কণ, টাড় এবং রত্নজড়িত অঙ্গুষ্ঠির কথা বলা হয়েছে, আলাওল সেখানে বলছেন, অঙ্গদ, কঙ্কন, বলয়া এবং গুজরাটি চুড়ির কথা। টাড় অলঙ্কারটি পশ্চিম অযোধ্যা, প্রতাপগড়, সুলতানপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। বাংলা দেশে বাহুর যে অলঙ্কার প্রচলিত তা হচ্ছে অনন্ত। আলাওলের বর্ণিত অলঙ্কার অঙ্গদ, বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত বাজুবন্দ। এই অলঙ্কারটি বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত। কঙ্কণ বা খাড়ুও তেমনি সর্ব অঞ্চলেই প্রচলিত।

আলাওলের ষোড়শ স্তবকটি মূলের পঞ্চদশ স্তবক। এ স্তবকটিতে পদ্মাবতীর স্তনযুগল বর্ণিত হয়েছে। আলাওল এখানে মূলকে অনুসরণ করেন নি। মূলের সাতটি চরণদ্বৈত এবং দোহা অংশের দুটি চরণ আলাওলের কাব্যে ছত্রিশটি চরণে পরিণত হয়েছে। বক্ষস্থলকে আলাওল নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। এবং বিভিন্ন উপমার বিন্যাসে তার স্বরূপকে উজ্জ্বল

করেছেন। দেহের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় এ বর্ণনা সীমাতিরিক্ত। জায়সীর কাব্যের গঠনরীতিতে একটি আশ্চর্য শৃঙ্খলা এবং চরণবিন্যাসে নিয়মানুবর্তিতা আছে, আলাওলের কাব্যে এ নিয়মানুবর্তিতার অভাব লক্ষিত হয়।

আলাওলের সপ্তদশ স্তবক মূলের ষোড়শ স্তবক। এই স্তবকে পদ্মাবতীর উদর এবং উদরের রোমাবলীর ত্রিবলী রেখার বর্ণনা আছে। আরম্ভে মূলে আছে যে, চন্দন চর্চিত পদ্মাবতীর উদর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তার বর্ণ কুমকুম কেশরের মতো, আলাওলের বর্ণনাটি এখানে একটু স্থূল হয়েছে। তিনি বলছেন:

মলয়া কুহুম কেশর রাশি সার।
একত্রে ছানিয়া কৈল উদর সঞ্চার॥
কোমল পাতল পেট সৃজিল গোসাঞি।
সৌষ্ঠব রচন অন্তরে অন্ত নাই॥

মূলের দুটি চরণ অনুবাদে চারটি চরণে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী দুটি চরণও মূলের অনুগত, যেখানে বলা হয়েছে যে পদ্মাবতীর আহার্য বস্তু হচ্ছে পান এবং ফুল, ক্ষীরাহার পর্যন্ত তার কাছে গুরুভার মনে হয়। মূলে আছে যে, পদ্মাবতীর রোমাবলী দুটি নারাঙ্গীর মধ্যদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং হঠাৎ সেখানে ময়ূরকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলাওল সেখানে নারাঙ্গীর কথা না বলে পর্বতের কথা বলছেন। এর পর মূলে যেখানে রোমাবলীকে বলা হয়েছে চন্দনের স্তম্ভের উপর ভ্রমরের পংক্তি, আলাওল সেখানে চন্দনের স্তম্ভের কথা বলেন নি, ভ্রমরের পংক্তির কথা বলেছেন।

মূলের সপ্তদশ স্তবকে জায়সী পদ্মাবতীর পৃষ্ঠদেশের বর্ণনা করেছেন, আলাওলের কাব্যে সে বর্ণনা নেই।

মূলের ঊনবিংশ স্তবকে পদ্মাবতীর নাভিদেশের বর্ণনা করা হয়েছে। আলাওল ভিন্ন কোন স্তবকে নাভিদেশের বর্ণনা করেননি, কিন্তু নাভিনিম্নে পদ্মাবতীর গুপ্ত দেহভাগের বর্ণনা আলাওল বিংশ স্তবকে নিতম্ব বর্ণনার সঙ্গে করেছেন। জায়সীতে সে বর্ণনাটি ঊনবিংশ স্তবকেই।

অষ্টাদশ সর্গে উভয় কাব্যেই পদ্মাবতীর কটিদেশ বর্ণিত হয়েছে। আলাওল সিংহসদৃশ কটি বর্ণনা করতে যেয়ে কতকগুলি নূতন ব্যঞ্জনা এনেছেন যা মূলে নেই। মূলের সঙ্গে সম্পর্কহীন সে সংযোজনটা এই :

গিরিশৃঙ্গ পরে সিংহ বৈসে অনুক্ষণ।
জগতে প্রচার গিরি সুতার বাহন॥
করিকুম্ভ বিদারি ভুঞ্জএ মৃগপতি।
হরিগন্ধে করি পলায়ন্ত শীঘ্রগতি।
হেন সিংহ গিরি অধে সতত বসতি।
হরের বাহন হইল তেজিয়া পার্বতী॥
করিকুম্ভ বসতি পারীন্দ্র শির পর।
বড় অপরূপ অতি দেখ মনোহর॥

মূলের বিংশ স্তবক পদ্মাবতীর নিতম্ব, জঙ্ঘা এবং পদদ্বয় বর্ণনা। সমস্ত বর্ণনা শেষে জায়সী পায়ের এবং পদাঙ্গুলীর অলঙ্কারের বর্ণনা করেছেন। আলাওলের কাব্যে একবিংশ স্তবকে উরু, পদদ্বয় এবং পদাঙ্গুলির অলঙ্কারের বর্ণনা এসেছে।

সর্বশেষে আলাওল পদ্মাবতীর বিভিন্ন বসন ভূষণের বর্ণনা করেছেন, জায়সীর কাব্যে তা অনুপস্থিত।

এভাবে তুলনামূলক আলোচনায় ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে পদ্মাবতীর সৌন্দর্যবর্ণনা অধ্যায়ে আলাওলের নিজস্ব কবিসত্তার প্রকাশ আছে। তথ্য সংগ্রহে জায়সীর উপর নির্ভরশীল হলেও এ সর্গে আলাওল মূলতঃ অনুবাদক নন, বরঞ্চ নূতন তাৎপর্যের কবি।

টীকা

১। প্রধান প্রধান সংস্কৃত কবিগণ দেবতার অঙ্গ-শোভা বর্ণনকালে পদনখ-বর্ণন থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বশেষে কেশবর্ণন করতেন এবং মানুষের ক্ষেত্রে কেশ-বর্ণন থেকে আরম্ভ ক'রে অবশেষে পদনখ-বর্ণন করতেন। পদ্মাবতী দেবী নয়, মানুষী, তাই তার রূপ-বর্ণনায় প্রথমেই শিরোদেশের কস্তুরি-সুগন্ধিত কেশের উল্লেখ করা হ'য়েছে। তা'ছাড়া প্রেমানুরাগী প্রথমেই প্রিয়তমার কেশ এবং তারপর নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং উপাসক ভক্ত উপাস্য দেবীকে প্রণাম করতে যেয়ে প্রথমেই তার চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

২। অষ্টকুল নাগ— বাসুকি, তক্ষক, কুলক, ককেটিক, পদ্ম, শঙ্খচূড়, মহাপদ্ম এবং ধনঞ্জয়।

৩। মনঝনের 'মধুমালতী'তেও সীমন্তকে খড়্গধারের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। (মধুমালতী, স্তবক ৭৭)।

৪। তুলনীয়: মধুমালতী: "নিহ কলংক সসি তুইজি লিলারা" (স্তবক ৮১)।

৫। কপালের তিলকচিহ্নকে ধ্রুব নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। পৌরাণিক উপাখ্যানে আছে যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব একদিন পিতার কোলে ব'সেছিল, তখন তার বিমাতা সেখান থেকে তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেয়। সে-ক্ষোভে ধ্রুব গৃহত্যাগ ক'রে গভীর বনে যেয়ে তপস্যা ক'রতে থাকে। তা'র তপস্যায় সন্তুষ্ট হ'য়ে বিষ্ণু তাকে আকাশের সর্বোচ্চ শূন্যে একটি অচল আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৬। পুরাণে কথিত আছে যে রাজা সহস্রবাহুর কন্যা রেণুকার বিবাহ হয় জমদগ্নি মুনির সঙ্গে। এ-বিবাহের ফলে জন্ম হয় পরশুরামের, যিনি ছিলেন দশাবতারের এক অবতার। বড় হ'য়ে পরশুরাম কোনও এক বনে তপস্যা করতে থাকেন। এ-অবসরে সহস্রবাহু আপন কন্যা রেণুকাকে দেখতে আসেন। তিনি জমদগ্নিকে অরণ্যবাসী সাধারণ এক মুনি বিবেচনা ক'রে পরিহাস করবার ইচ্ছায় বললেন যে, তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী সকলকে যথোচিত পান-ভোজনে আপ্যায়িত করতে হবে। জমদগ্নি মন্ত্র-প্রভাবে স্বর্গের কামধেনুকে ডেকে সহস্রবাহুকে আপ্যায়ন করলেন। সহস্রবাহু কামধেনুকে পাবার আশায় জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে যেয়ে পরশুরাম সহস্র-বাহুকে হত্যা করেন এবং পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন।

৭। তুলনীয়: মনঝন—"অধর অমিয় রস ভরে সোহা এ" (স্তবক ৮৭)।

৮। সংস্কৃত পণ্ডিতদের একটি বিশেষ চতুরতার পরিচয় প্রকাশ পায় একই সঙ্গে অনেক অর্থ আরোপ করার মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ সুধাকর দ্বিবেদী একটি কাহিনীর উল্লেখ ক'রেছেন। কৃষ্ণ একদিন ছয়জন গোপ-বালিকার সঙ্গে অবসর-বিনোদন করছিলেন। প্রথম গোপী আহারের পাত্র হিসেবে কৃষ্ণকে কদলীপত্র আনতে বললো; দ্বিতীয়া কৃষ্ণকে তার গৃহে আসতে বললো; তৃতীয়া বল্‌লো, 'আমাকে কর্ণ-ফুল' পরিয়ে দাও'; চতুর্থী বল্‌লো, 'আমাকে আগুন এনে দাও; পঞ্চমা বল্‌লো, 'আমাকে ফুল এনে দাও; সর্বশেষ গোপী বললো, 'আমাকে জল দাও'। কৃষ্ণ সকলের উত্তর একটি বাক্যে দিলেন— "বারী নহঁী"। প্রথমার উত্তরে 'বারী'র অর্থ হল, যে-চাকর কদলীপত্র সাজায় সে নেই; দ্বিতীয়ার জন্য উত্তর হল হ'ল, তোমার ঘরে আসবার সময় হয়নি (বারী=পারী, অর্থাৎ কোনও কার্যের বা উক্তির ক্রম); তৃতীয়ার জন্য উত্তর হ'ল, 'বালী', যাতে কর্ণফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তা' নেই; চতুর্থীর জন্য হ'ল যে, আগুন যা' দিয়ে জ্বালায় তা' নেই; পঞ্চমার জন্য উত্তর হ'ল যে, ফুলবারী নেই এবং সর্বশেষ গোপীর জন্য উত্তর হ'ল যে বারী=বারি বা জল নেই। এ-ঘটনাটি একটি হিন্দী কবিতায় নিম্নরূপে বর্ণিত আছে:

"পতরী দে ঘর আব
করণ-ফুল পহিরার মোঁহি।
আগি ফুল জল লাব
কৃষ্ণ কহী বারী নহঁী॥"

৯। তুলনীয়: মনঝন—"সুভর সীপ সবন সোহাএ।" (স্তবক ৯১)

১০। তুলনীয়: মনঝন:

"কৌন সো তপা জাহি লগি
নিরমী ঐসি গীব জগদীস।" (স্তবক ৯২)

১১। টাড়—বাজুবন্ধের মতো একটি অলঙ্কার। পশ্চিম অযোধ্যা, প্রতাপগড় এ-সব অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

১২। মনঝনের মধুমালতীতে স্তনের বর্ণনা নিম্নরূপ: "তার দুটি অমূল্য স্তন অতি সুডৌল যা দেখে ত্রিভুবন চঞ্চল হয়। বিধাতা তার কঠিন হৃদয়ের মধ্যে তা নির্মাণ ক'রেছে, সে-কারণে স্তনদ্বয় অত্যন্ত সুদৃঢ়। যখন হৃদয় হৃদয়ে সঞ্চরণ করে তখন স্বাগত করবার জন্য কুচদ্বয় উঠে দাঁড়ায়। স্তন দুটি অনুপম এবং নবীন শ্রীফল, তার

যেন যুবতীর তারুণ্যের উপঢৌকনরূপে এসেছে। যখন প্রিয়ার হৃদয়ে প্রাণ-পতি শোভা পায়, তখন তার স্তন সঙ্কোচের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে চায়। কঠোর এবং কৃষ্ণবর্ণ শিরোদেশ নিয়ে রমনীর স্তন দুটি কারো কাছে মাথা নত করে না। প্রতিটি স্তনই আপন সীমার মধ্যে বিজয়িনী এবং তারা একে অন্যের সঙ্গে কখনও মিলিত হয় না। তার কুচের অগ্রভাগ এত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ যে দৃষ্টি পড়লেই হৃদয়ে আত্মগোপন করে। কুচাগ্রভাগের শ্যাম শীর্ষ যেন ত্রিভুবনপ্রসিদ্ধ মহাবীর। স্তন দুটি আপন সীমায় শোভিত থেকে একে অন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ব্যবধানরূপে গলার হার এসে পড়ে। উভয় স্তনই বীর এবং রণদক্ষ, যুদ্ধের সংবাদে সর্বদাই সুসজ্জিত ও প্রস্তুত। সর্বমুহূর্তেই প্রহার করা তাদের স্বভাব। এরা সর্বদা সম্মুখবর্তী, কখনও পশ্চাৎ ফেরেনা।" (স্তবক ২৪, ২৫)

জায়সীর স্তন-বর্ণনায় 'কনক-কচোরা' শব্দটির একটি অপব্যাখ্যা ক'রেছেন সুধাকর দ্বিবেদী। ফারসী হরফে সব কটি পাণ্ডুলিপিতে "কানাক্ কাচুর" এভাবে কথাটি লিখিত আছে। সুধাকর দ্বিবেদী তা পাঠ ক'রেছেন 'কণিক কচউরি' ব'লে এবং তা'র অর্থ ক'রেছেন, চক্রাকার স্তন যেন কড়াইতে ফুলে ওঠা বাদামী রংএর ময়দার কচৌরী— "চক্রাকার উঠ্‌তে হুএ স্তন, করাহী মেঁ ফুলতী হুঈ বদামী রংগ কী কনিক-কচৌরী সে জান পড়তে হৈঁ" (সুধাকর চন্দ্রিকা, পৃঃ ২০২)। কচোর বা কচোরা শব্দটির সংস্কৃত 'কচ্চোলক' এবং প্রাকৃত 'কচ্চোল, কচ্চোলয়' থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ কটোরা বা পেয়ালা।

১৩। সংস্কৃত কাব্যে স্ত্রীলোকের কৃশ উদর সৌন্দর্যের লক্ষণ। এ-কারণে সুন্দরী যুবতীকে কৃশোদরী বলা হত।

১৪। তুলনীয়: মনঝন: "রোমাবলি নগিনি বিস ভরী।" (স্তবক ৯৬)

১৫। বানারসী কুণ্ড—এক সময় একে বলা হ'ত 'কাশীমরণান্মুক্তিঃ', কেননা এখানে পাপীরা মুক্তির কামনায় আত্মহত্যা করতো।

১৬। কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয় নাগ-দমনের পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

১৭। জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ সংহিতাকারগণ লিখেছেন যে সাপের ফণা এবং কমলের উপর ব'সে-থাকা খঞ্জন দেখ্‌লে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়।

১৮। মনঝনে এ-বর্ণনাটি নেই। কারণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন—

"গুরুজন লাজ মনহি মন মানেউঁ।
তৌ নহিঁ মদন ভঁডার বখানেউঁ॥" (স্তবক ৯৭)

১৯। কৃশ কটি না হ'লে নিতম্বের শোভা হয় না। নিতম্ব হবে স্থূল এবং কটি হবে কৃশ, তবেই-তো রমণী সুন্দরী।

২০। অতিশয়োক্তি। চল্‌বার সময় ভূমি-সংস্পর্শে পায়ে যেন আঘাত না লাগে, সেজন্য দেবতারা তার পদদ্বয় ধারণ ক'রে আছে।

পদ্মাবতীর রূপ-বর্ণন খণ্ড

আমার সম্পাদিত আলাওলের পাঠ

(পাঠ ব্যতিক্রম দেখানো হয়নি)

॥ ১ ॥ পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ।
তুলনা দিবারে নাহি ত্রিজগত মাঝ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ।
মহা অন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কেহ নহে সমসর॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবন মোহন।
এক গুণে ডংসিতে পারয় ত্রিভুবন॥
বিরচিত কুসুম্ব গুঁথিত মুক্তাহার।
সঘন জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার॥

॥ ২ ॥ তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী॥
স্বর্গ হন্তে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য মাঝে মহাসূক্ষ্ম পথ॥
যেই পন্থে বাটওয়ার বেসে অনুদিন।
কুটিল অলকা পাশে ব্যক্ত রক্তচিন॥
কিবা কষটির মাঝে স্বর্ণ রেখাকার।
যমুনার মধ্যে কিবা সুরস্বরী-ধার॥
জন্মান্তরে বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিবেণী উপরে কিবা ধরিছে করাত॥
কিবা মুখ চন্দ্র-আঁখি অরুণ দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে যেন তিমিরের হিয়া॥

কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার।
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ খড়্গধার॥
কদাঞ্চিত কেহ যদি যাএ গম্য আশে।
মন বন্দী হএ তার অলকার ফাঁসে॥

॥ ৩ ॥ ভাগ্যের উদয়স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনুহর॥
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মোহন ললাট চন্দ্র ভাগ্যবিধি চিন॥
কেমতে বোলিমু ভাল তুলনা ময়ঙ্ক।
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক॥
কুহু রাহু করে চন্দ্র আলোপ গরাস।
মোহন ললাট চন্দ্র সতত প্রকাশ॥
খেনেক আলোপ চন্দ্র খেনেক বিদিত।
প্রসিদ্ধ ললাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত॥
মৃগমদ-তিলক সিন্দূর চারি পাশ।
চন্দ্রিমা উপরে রাহু মিহির গরাস॥
শ্বেতবিন্দু ললাটেত উগএ যখন।
মুকুতা আইল কিবা ভ্রাতৃ সম্ভাষণ॥
যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটেত হইব সংযোগ নিশ্চয়॥

॥ ৪ ॥ কামের কোদণ্ড ভুরু অলক্ষ্য সন্ধান।
যাহারে হেরএ তার হানএ পরান॥
ভুরু ভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুম্ব শরধনু॥
ভুরু ধনু গুণাঞ্জন বিশিখ কটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া যেই লক্ষ্য॥
কদাঞ্চিৎ গগনে উগিলে ইন্দ্র ধনু।
ভুরু ভঙ্গ দরশনে লুকাএ নিজ তনু॥

ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল॥

॥ ৫ ॥

প্রভারুণ বর্ণ-আঁখি সুচারু নির্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল॥
কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত॥
আঁখিত পুত্তলি শোভে রক্ত শ্বেতান্তর।
ভুলিতে কমল রসে নিচল ভ্রমর॥
কিঞ্চিৎ লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হএ মুনিমন ভঙ্গ॥
ইষৎ চালনি সুভঙ্গিমা আঁখি সানে।
ত্রিজগত প্রাণী হরে কটাক্ষ সন্ধানে॥
সদামত্ত চঞ্চল ঘূর্ণিত সলজ্জিত।
শ্বেতারুণ সুআঞ্জন রেখায় বর্ণিত॥
অরুণ লুকিত যেন আপনার জ্যোতে।
সমদৃষ্টি চাহিতে নারী বর্ণিব কেমতে॥
নির্মল দর্পণ যদি সতত লাড়এ।
কহিতে না পারে নিজ ছায়ার নির্ণয়॥
আর এক অপূর্ব কহিতে ভয় বাসি।
অন্ধকার দিবস উজ্জ্বলতম নিশি॥

॥ ৬ ॥

তাহাতে বরুণীকুল সূচি মুখ বাণ।
কটাক্ষ সংযোগে করে সতত সন্ধান॥
কামের কোদণ্ড ভুরু কিঞ্চিৎ না টুটে।
কটক নির্মিতে কেহ না হএ নিকটে॥
নক্ষত্র করিয়া সবে জগতে বোলএ।
পলকের ঘাতে স্বর্গ হৈছে রন্ধ্রমএ॥
সম দৃষ্টি করি পল দিয়া করে সান।
টুটেক বঙ্কিম ভঙ্গে হানে বিষ-বাণ॥

ঢাকিয়া ঢাকিয়া পলে প্রাণ হরে যবে।
স্বইচ্ছায় প্রাণ দিতে বাঞ্ছা করে সবে॥
বঙ্কিম কটাক্ষ শর অস্থির ঘাতক।
তথাপিহ জগজন মরণ যাচক॥

॥ ৭ ॥ নাসা হেরি শুকপক্ষী গতি বনান্তর।
লাজে তিল কুসুম্বিনী ধূলায় ধূসর॥
খগপতি চঞ্চু জিনি নাসা সুললিত।
ত্রিভুবন মোহন সহজে অতুলিত॥
সে নাসা পরশ হেতু যত পুষ্পগণ।
সৌরভ হইতে কৈল বিধি আরাধন॥
দশন ডালিম্ব বীজ অধর বিম্ব ফল।
অতি লোভে মজি শুক রহিল নিশ্চল॥
সুরঙ্গ অধর সুধা রসের বসতি।
অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি॥

॥ ৮ ॥ সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিম্ব বান্ধুলি গমন বনান্তর॥
মাণিক্য প্রবাল অতি নীরস কর্কশ।
অধরে অমিয়া স্রবে এহি মহারস॥
রাতুল উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।
তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে॥
আঁখি হৈল নীলোৎপল পুণ্য দরশনে।
কার ভাগ্যফলে বিধি সৃজিল যতনে॥
পুণ্যফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হৈব অমর॥
অধরের রস বন-ইক্ষু সমতুল।
মাণিক্য অধর রস সহজে অমূল॥

॥ ৯ ॥ দন্ত হীরা পাঁতি কিবা দধি সুতাসুত।
মধ্যেত অসিত রেখা অতি অদ্ভুত॥

মৃদু মন্দ হাসি কিবা অমিয়া মিশ্রিত।
সুধা বরিষণে সৌদামিনী প্রকাশিত॥
যখনে সৃজিল বিধি জগতের জ্যোতি।
কিঞ্চিৎ ঝলক পাইল হীরা-রত্ন মতি॥
বিম্বত তুলনা নাহি তুলিমু কি দিয়া।
অতি দুঃখে দাড়িম্ব বিদরে নিজ হিয়া॥

॥ ১০ ॥ রসনা কমল পত্র রসাল বচন।
ইষৎ হাসিতে হএ সুধা বরিষণ॥
লজ্জিত চাতক পিক শুনি মধু বাণী।
সমতুল নহে জান বংশীকুলধ্বনি॥
শ্রবণে পরশে মাত্র অঙ্গ পুলকিত।
প্রেম রস ভাবে ভুলি আনন্দ পূর্ণিত॥
পড়এ ব্যাকরণ গ্রন্থ বেদার্থ পুরাণ।
জ্ঞানী স্তব্ধ এক শব্দ সতত বাখান॥
অমর পিঙ্গল গীতা নাটিকা আগম।
সুর-গুরু সম শাস্ত্রে সুচারু সুষম॥
বলিতে বচন মাত্র শুনি কাব্য প্রায়।
অর্থ বুঝি গুণিগণ পরাভব পায়॥

॥ ১১ ॥ সুরঙ্গ কপোল বর্ণ চারু সুললিত।
জিনিয়া কমল পত্র অতি সুশোভিত॥
তার বাম পাশে এক তিল মনুহর।
পুতুলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর॥
যেই তিল সেই তিলে হয় দরশন।
তিলে তিলে করি অঙ্গ করএ দহন॥
নয়ান আঞ্জন কর্ণ হৈতে রেখা শোভে।
চঞ্চু মেলি খঞ্জন রহিছে তিল লোভে॥

॥ ১২ ॥ শ্রবণ যুগল চারু জিনি সিন্ধু সুতা।
জগ মন পাতিয়ায় ঝলকে মুকুতা॥

লজ্জাএ গৃধিনী পক্ষী উড়িল আকাশে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে অরুণ প্রকাশে॥
তাহাত রতন কুল জড়িত সুরূপ।
তারকা অরুণ সঙ্গে বড় অপরূপ॥
খেনে খেনে খোটিলা পরএ মনোহর।
দুই দিকে যেন দুই দীপক সুন্দর॥
খেনে খেনে ঢাকি কর্ণ ফুল শোভে খুন্তী।
দরশন মাত্র হএ জগ-মন লুভি॥
যখনে চিকণ বস্ত্রে করএ ঘোঁঘট।
কর্ণান্তরে অর্কতারা কিঞ্চিৎ প্রকট॥
কনক কষটি পত্র কাম্পে থর থর।
চমকে বিজুলি যেন শ্বেত ঘনান্তর॥

॥ ১৩ ॥

দেখিয়া বদন চন্দ্র মনে ধন্ধ বাসি।
দিনে দিনে ক্ষীণ হএ পুর্ণিমার শশী॥
কনক মুকুর জিনি মুখ জ্যোতি সাজে।
লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে॥
দেখহ অপূর্ব রীত বদন উপরে।
পদ্ম যুগ বন্দী হএ চন্দ্রের মাঝারে॥
শত্রু মধ্যে মিত্র বন্দী দেখি দিবাকর।
ধরিয়া সিন্দুর রূপ আইল নিয়র॥
ভুরু যুগ ধনুক করিয়া পঞ্চবাণ।
তিলে তিলে হানে বাণ কটাক্ষ সন্ধান॥
কমল নয়ান মিত্র মনে এহি দুঃখ।
নিকটে থাকিয়া না দেখএ মিত্র মুখ॥
তেকারণে যেবা দূরে থাকে বাণ ঘাএ।
ঘোঁঘট অন্তরে থাকি বিশিখ করয়॥
অরুণ অম্বুজ নাসা বুঝিয়া চরিত।
নথ রূপে বিষ্ণুচক্র লৈয়া উপস্থিত॥

আর এক অপরূপ শুন মহাজন।
সংসারে বিখ্যাত মৃগ চান্দের বাহন॥
যথা তথা নরগণ দেখি মৃগ কুল।
আখেট করিতে করে আরতি বাহুল॥
সেই মৃগ আঁংখি দেখ চান্দের উপর।
নর আহির করে নিতি লই ধনুশর॥
সুন্দর চিবুক কিবা সুপক্ক রসাল।
যতেক বাখান করি ততোধিক ভাল॥
হিঙ্গুল মিশ্রিত কুন্দিয়াছে ক্ষীর সার।
নিজ করে যতনে কি গঠিছে করতার॥

॥ ১৪ ॥ সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার।
লাজে ক্রৌঞ্চ পক্ষী গেল শিখর মাঝার॥
নীলকণ্ঠ তাম্রচূড়া নহে সমসর।
শকতি পরেয়া জিনি গিম মনোহর॥
কাচের গঠন জিনি গিম মনোরথ।
ঘুঁটিতে তাম্বুল রস দেখএ বেকত॥
তেই ঠাঁই তিন রেখা দেখিতে কৌতুক।
লাজ হেতু কম্বু বর জলে দিল লুক॥
পূর্বজন্মে কোন তপ সাধিছে অসীম।
কার ভুজে সমর্পণ হৈব হেন গিম॥

॥ ১৫ ॥ জিনিয়া কনক-দণ্ড ভুজ মনুহর।
নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর॥
কমল মৃণাল পুনি সমতুল নয়।
তে কারণে অতি কৃশ অঙ্গ রন্ধ্রময়॥
করিরাজ শুণ্ড লাজে দিতে নারি তুল।
তাহার অগ্রেত কর-পল্লব রাতুল॥
চতুরের মর্মান্তরে করযুগ ক্ষেপি।
বাহির করিছে কিবা করে রক্ত লেপি॥

কিবা স্থল কমল কি রাতুল উৎপল।
প্রভাকর উষ্ণ কর-পল্লব শীতল॥
দোলাইতে করগতি লক্ষণ না যাএ।
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা হস্তক দেখাএ॥
তাহাতে অঙ্গুলিকুল অতি মনোহর।
চম্পক কলিকা নহে তার সমসর॥
রতনে জড়িত বাহু অঙ্গদ কঙ্কন।
রঞ্জিত বলয়কুল ত্রিজগ-মোহন॥
দন্তী দন্তে বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি।
ক্ষাণে ক্ষণে সুশোভিত চুড়ি গুজরাটি॥
করশাখে নব রত্ন জড়িত অঙ্গুরী।
দেখিতে শরীর শূন্য প্রাণ যায় উড়ি॥

॥ ১৬ ॥ স্বর্ণস্থালী জিনিয়া হৃদয় পরিপাটি।
কনক কটোরা দুই রাখিছে উলটি॥
ফলের উপমা কি কহিব কবিকুল।
বিচারি চাহিল সব নহে সমতুল॥
দেখিয়া সুন্দর অতি কুচযুগ ভঙ্গি।
সুরঙ্গী হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গি॥
বড়হি কঠিন চিত্ত উরোজ অবলা।
কমল শরীর নাম ধরিল কমলা॥
শ্যামতারা নাম ধরে সম তার নয়।
তে কারণে ডালেত পিঙ্গল বর্ণ হয়॥
ডালিম্ব দেখিয়া কুচ অতি সুরুচির।
লজ্জাএ বিদার হএ আপনা শরীর॥
কটিলতা ভাবিয়া শরীর করি কষ্ট।
তথাপিহ তুল নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট॥
জামির ছোলঙ্গ পুনি অম্লরস হৈয়া।
ডালেত পিঙ্গল হএ অতি লজ্জা পাইয়া॥
কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিয়া ভাল।

উলটা সংযোগে পুনি হয় লতা ডাল ॥
কনক কলসি কিবা ভরিয়া রতন।
শ্যাম চাঁদ শিরে দিয়া রাখিছে মদন ॥
করিবর শৃঙ্গ জিনি কুচ মনোহর।
নিচলে রাখিছে কিবা হেম ধরাধর ॥
চক্রবাক যুগ নিশি বিচ্ছেদের ডরে।
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃস্বরে ॥
সগর্ব আদরে কটিলতা অতিশয়।
রাজচক্রবর্তী শির নম্রহ করএ ॥
শ্যাম ছত্র শিরেত বেকত ছত্রপতি।
স্বইচ্ছায় কর দিতে সবার আরতি ॥
উরঃ-সিংহাসনে বৈসে অবলার বল।
একপাটে দুই রাজা বড় কুতুহল ॥
কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ।
যুবক আনন্দ ধিক বালক জীবন ॥
সত্যাঞ্চল অন্তস্পটে থাকএ সর্বক্ষণ।
পরশিতে নারে কেহ মানস নয়ন ॥
নৃপকুলে বহু যত্নে দেব আরাধেন্ত।
কর দিতে নারে সবে কর কচালেন্ত ॥

॥ ১৭ ॥ মলয়া কুমকুম কেশর রাশি সার।
একত্রে ছানিয়া কৈল উদর সঞ্চার ॥
কোমল পাতল পেট সৃজিল গোসাঞি।
সৌষ্ঠব রচন অন্তরে অন্ত্র নাঞি ॥
ক্ষীরাহার করিতে লাগএ অতিভার।
সুরস তাম্বুল সুগন্ধি পুষ্পহার ॥
নাভিকুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।
তাহাতে পড়িলে মাত্র নাহিক উদ্ধার ॥
রোমাবলী নাগিনী বৈসএ কুণ্ডান্তরে।

পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে॥
গীম নীলকণ্ঠ গিরি সম্মুখে দেখিয়া।
শৈল সন্ধি সংযোগে রহিল লুকাইয়া॥
সুরঙ্গ অধর মধ্যে সুধারস অতি।
মধুলোভে উঠে কিবা পিপীলিকা পাঁতি॥
মুক্তাহার গঙ্গাধার পন্থেত দেখিয়া।
সম্বরি রহিল মন ভোরমতি হৈয়া॥
কিবা কুচ হর কাম করিতে বিনাশ।
হরধনু ধরে রোমাবলী নাগপাশ॥
ধনুঃশর মহেশ্বর নহে অস্ত্রতুল।
নিজ অস্ত্র ধরে তেঁহ ত্রিবলি ত্রিশূল॥

॥ ১৮ ॥ মৃগ রাজ জিনি কটি পরম সুন্দর।
হরের ডম্বর পুনি নহে সমসর॥
পিপীলিকা ভৃঙ্গ কটি জিনি অতি ক্ষীণ।
ভাঙ্গিয়া পড়এ কিবা উর্দ্ধগিরি চিন॥
এহি লাগি সৃজিল বিধি ইন্দ্র বজ্র দিয়া।
লোম লতা লক্ষ্যে পুনি রাখিল বান্ধিয়া॥
গিরিশৃঙ্গ পরে সিংহ বৈসে অনুক্ষণ।
জগতে প্রচার গিরি সুতার বাহন॥
করি কুম্ভ বিদারি ভুঞ্জএ মৃগপতি।
হরি গন্ধে করি পলায়ন্ত শীঘ্রগতি॥
হেন সিংহ গিরি অধে সতত বসতি॥
হরের বাহন হইল তেজিয়া পার্ব্বতী॥
করি কুম্ভ বসতি পারীন্দ্র শির পর।
বড় অপরূপ অতি দেখ মনোহর॥
যতেক বাখান কটি ততধিক চারু।
হরের নিকটে কিবা রাখিছে ডম্বরু॥
মুখর রসনা রত্ন তাহে বিরাজিত।
কিঞ্চিৎ দোলনে শব্দ উঠে সুললিত॥

॥ ১৯ ॥ সুচারু নিতম্ব অতি ধরে নিতম্বিণী।
করিবর কুম্ভ জিনি সুন্দর বলনি॥
নাভি অধঃস্থলে পুনি ত্রিজগ-মোহন।
উচিত কহিতে লাজ অকথ্য কথন॥
অভেদ আছয় সেই কমলের কলি।
না জানি পরশে কোন ভাগ্যবন্ত অলি॥
চন্দনের মাঝে কিবা মৃগপদ চিন।
আর কি বলিব তারে করিয়া প্রবীণ॥
শিবের পূজার স্থলী জান সবিশেষ।
কাম নিবারণ হএ পূজিলে মহেশ॥

॥ ২০ ॥ শ্রীরাম কদলি জিনি উরু মনুরম।
করিবর শুণ্ড পুনি নহে তার সম॥
মৃদু সুকোমল পদ অতি চারু তর।
স্থল জল কমল পুনি নহে সমসর॥
অতুলিত দেখি আঁখি মুখ করতল।
চরণ শরণে আসি ভজিল কমল॥
যাবক রঞ্জিত নখ দেখি লাগি ধন্ধ।
অরুণ বরণ হৈল বরমালা চান্দ॥
শোভিত নেপুর রত্ন আনট বিছিয়া।
চতুরে ফেলায় নিজ জীবন নিছিয়া॥
গজেন্দ্র গমন জিনি গতি অতি ভাল।
খঞ্জন গঞ্জন জিনি লজ্জিত মরাল॥
গমন ভঙ্গিমা হেরি স্বর্গ নারীগণ।
তে কারণে ভূমণ্ডলে না দে দরশন॥
খেনে খেনে মন্দ গতি চলন ঠমরু।
ঠমকি ঠমকি চলে ভঙ্গিমা সুচারু॥
নিজ গম্যে সহজে চলিতে বরনারী।
অঙ্গ ভঙ্গে চলে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি॥

চলিতে সুস্বর বাজে কিঙ্কিনি নেপুর।
ভ্রমে ভঙ্গ নহে তাল শব্দ সুমধুর॥
পদ পরশনে রেণু রক্ত বর্ণ হএ।
সিন্দূর করিয়া কুল রমণী পৈরএ॥
অতুল মানস পরশিতে নারে হাতে।
কমল ভরমে সবে থুইতে চাহে মাথে॥

॥ ২১ ॥ বসন ভুষণ রূপ বর্ণিতে না পারি।
খেনে পাট নেত পৈরে খেনে জরতারি॥
খেনে শাখা রমাপতি খেনে গঙ্গাজল।
খেনে কিরমিজি খেনে পৈরে মলমল॥
খেনে নীল খেনে পীত শ্বেতরক্ত বাস।
খেনে মসলিন খেনে ঝিলমিল তাস॥
নানা দেশী নানা বস্ত্র নানা রঙ্গে পৈরে।
তিলে তিলে নানা ভাতি নানা বর্ণ ধরে॥
যতেক বাখান করি অধিক মহিমা।
সুরনারী নরনারী জিনি রূপ সীমা॥
অতুল নির্মল রূপ ত্রিজগ মোহন।
দর্পণ অন্তরে মাত্র সেরূপ তুলন॥
এক মুখে রূপ ছবি কহন না জাএ।
ভাগ্যবল হেতু দেখি সেই পাতিআএ॥